বানর-নেতা ও রাক্ষস

একদা একদল বানর নতুন বাসস্থানের খোঁজে এক দূরবর্তী অরণ্যের দিকে যাত্রা করল। বানর-নেতা তাদের বলল, "এই অরণ্যের পুকুরগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার ভেতরে এক ভয়ংকর রাক্ষস বাস করে! আমাকে আগে না জিজ্ঞেস করে কেউ যেন কোনো পুকুরের জল পান করার চেষ্টা না করে!"

নেতা সেই এলাকার সমস্ত পুকুর পরিদর্শন করল। যখন সে নিশ্চিত হল যে পুকুরগুলো নিরাপদ, তখন সে দলটিকে সেখান থেকে জল পান করার অনুমতি দিল। বানরদল তাদের নতুন বাসস্থানে স্থিত হল।

একদিন তারা অরণ্যের এক নতুন অংশে গিয়ে পৌঁছাল। পথটা ছিল বেশ দীর্ঘ। একটি ছোট বানর ছানা বলল, "মা, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে!"





এক মুহূর্ত না ভেবেই তার মা উত্তর দিল, "ওই দেখো! আমি একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছি। চলো, ওখান থেকেই কিছুটা জল পান করি।"

"থামো! পুকুরের কাছে যেও না!" অন্য একটি বানর বলে উঠল। "তোমরা কি আমাদের নেতার সতর্কবাণীর কথা ভুলে গেছ?"

বানর-নেতা তাদের কাছে এগিয়ে এল। "তোমরা কি জল চাও? তবে একটু অপেক্ষা করো, আমি আগে পুকুরটি পরীক্ষা করে দেখি।"

সে পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল এবং খুব কাছ থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করল। "আহা!" সে বলে উঠল। "সব পায়ের ছাপই জলের দিকে গেছে। কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পায়ের ছাপ নেই। নিশ্চয়ই এটি সেই পুকুর, যেখানে রাক্ষসটি বাস করে!"

সে সব বানরকে ডেকে জড়ো করল। "শোনো সবাই," সে বলল। "এই পুকুরটি বিপজ্জনক। কেউ যেন এর ধারে-কাছেও না যায়।"

নেতার কথা শেষ হতে না হতেই পুকুরের ভেতর থেকে এক বীভৎস অট্টহাসি ভেসে এল: "হাহাহাহাহাহা!" জল ফুঁড়ে এক রাক্ষস উঠে এল। "যে-ই এই পুকুরের কাছে আসবে, আমি তাকেই গিলে খেয়ে ফেলব," সে হুমকি দিল।

" যদি আমরা পুকুরের মধ্যে নামি, তবেই তো তুমি আমাদের গিলে খেতে পারবে। আর আমাদের মধ্যে কেউই তেমন বোকামি করবে না," বানর-নেতা শান্তভাবে উত্তর দিল।

"তাহলে তো তোরা সবাই মারা যাবি! নাকি জল পান না করেও তোরা বেঁচে থাকতে পারবি?" রাক্ষসটি বিদ্রূপ করে বলল।

বানর-নেতা বলল, "একদমই না! আমরা তোমার পুকুরের জলই পান করব।"

"সেটা কীভাবে করবি?" রাক্ষসটি জানতে চাইল।

"তুমি শুধু অপেক্ষা করে দেখতে থাকো," নেতা উত্তর দিল।

এরপর সে কয়েকটি বানরকে বাঁশ সংগ্রহ করতে পাঠাল। তারা ফিরে আসার পর, নেতা সব বাঁশগুলো পরীক্ষা করে দেখল। সেগুলোর কয়েকটির ভেতরটা আগাগোড়া ফাঁপা ছিল। দলপতি ওগুলো নিজের কাছে রেখে দিল এবং বাকিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল।

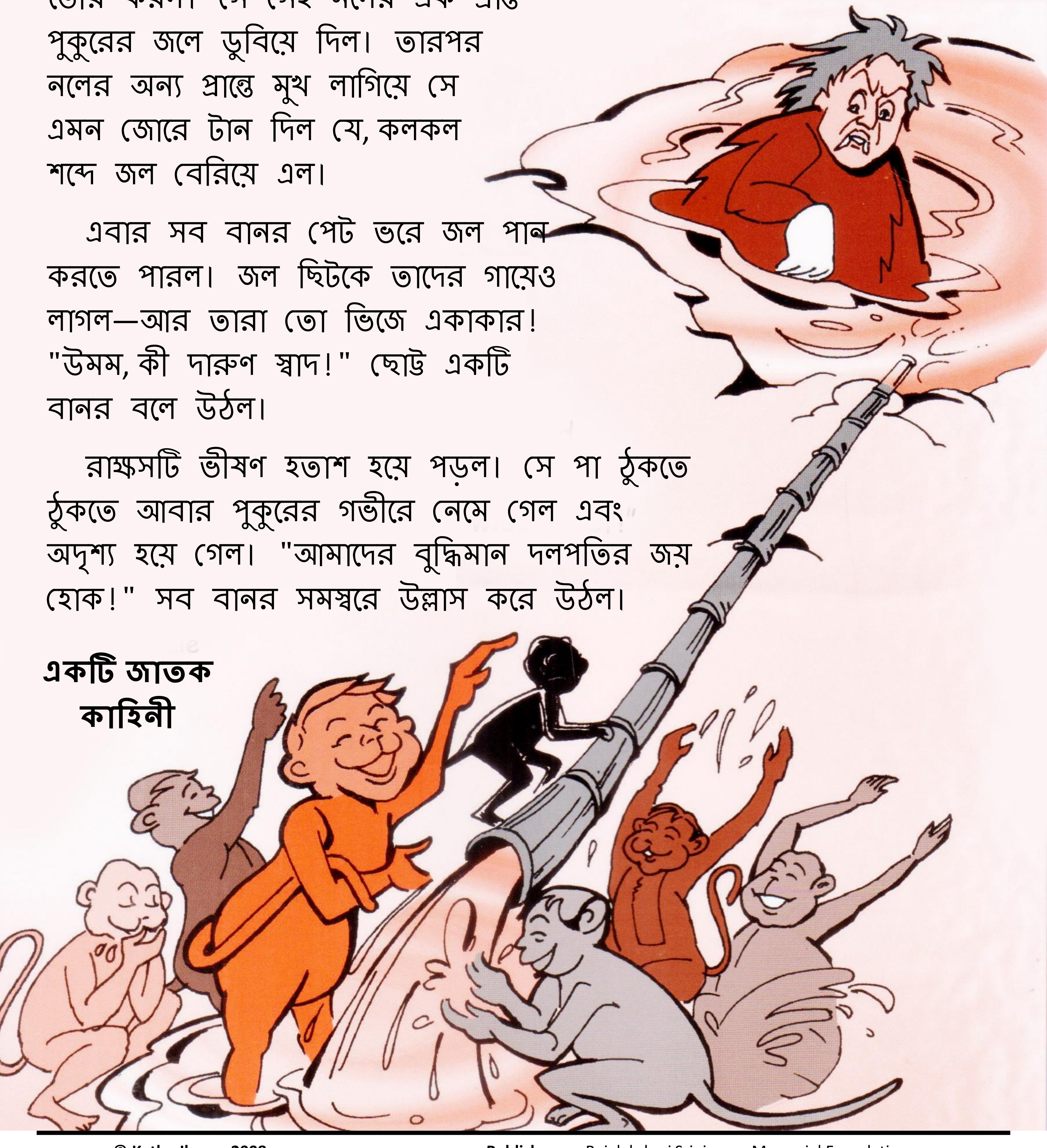


এরপর, সেই ফাঁপা বাঁশগুলো সব একজায়গায় করে, সে একটির ভেতর দিয়ে আরেকটি ঢুকিয়ে একটি লম্বা নল তৈরি করল। সে সেই নলের এক প্রান্ত পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর নলের অন্য প্রান্তে মুখ লাগিয়ে সে এমন জোরে টান দিল যে, কলকল শব্দে জল বেরিয়ে এল।

এবার সব বানর পেট ভরে জল পান করতে পারল। জল ছিটকে তাদের গায়েও লাগল—আর তারা তো ভিজে একাকার! "উমম, কী দারুণ স্বাদ!" ছোট্ট একটি বানর বলে উঠল।

রাক্ষসটি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। সে পা ঠুকতে ঠুকতে আবার পুকুরের গভীরে নেমে গেল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। "আমাদের বুদ্ধিমান দলপতির জয় হোক!" সব বানর সমস্বরে উল্লাস করে উঠল।

একটি জাতক কাহিনী



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhare

Artist Uma Krishnaswamy

মেরি খুশি

দীপা যখন ঘরে ঢুকল, তখন মেরি হাতে একটি কাগজ উঁচিয়ে ধরে ছিল। "ওহ, এটা তো একটা ছবি!" দীপা বলে উঠল। "আমি কি দেখতে পারি?"

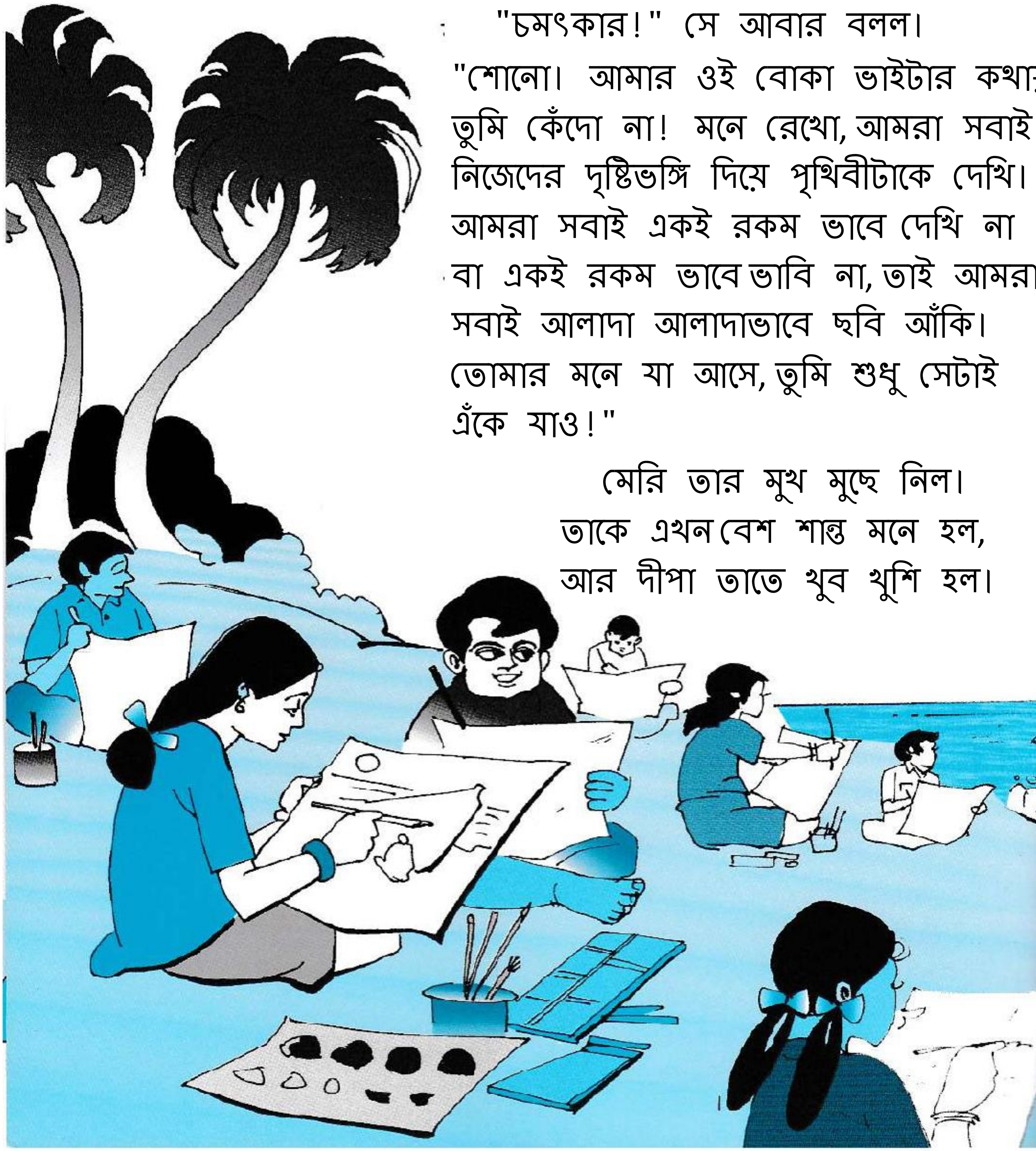
এরপর সে তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। মেরির চোখ জলে ছলছল করছিল! দীপা তো অবাক। "কেঁদো না!" সে বলল। "কী হয়েছে?"

"আমি তোমার বাগানে বসে ছবি আঁকছিলাম," মেরি ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল। "রঘু সেখানে এল আর আমার ছবিটা দেখল। সে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল, দীপা!"



"ওহ, মেরি!" দীপা বলল। মেরি তার চোখের জল আটকে রাখার চেষ্টা করল। "ও বলল আমার ছবিটা একদমই ভালো হয়নি!" মেরি বলতে থাকল। "আমি আর কখনোই, ছবি আঁকব না! কক্ষনো না!"

"কিন্তু এটা তো চমৎকার হয়েছে!" দীপা বলল। খুব যত্ন করে সে মেরির হাত থেকে আঁকা ছবিটি নিল। সে খুব কাছ থেকে ছবিটি খুঁটিয়ে দেখল।



"চমৎকার!" সে আবার বলল। "শোনো। আমার ওই বোকা ভাইটার কথায় তুমি কেঁদো না! মনে রেখো, আমরা সবাই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখি। আমরা সবাই একই রকম ভাবে দেখি না বা একই রকম ভাবে ভাবি না, তাই আমরা সবাই আলাদা আলাদাভাবে ছবি আঁকি। তোমার মনে যা আসে, তুমি শুধু সেটাই এঁকে যাও!"

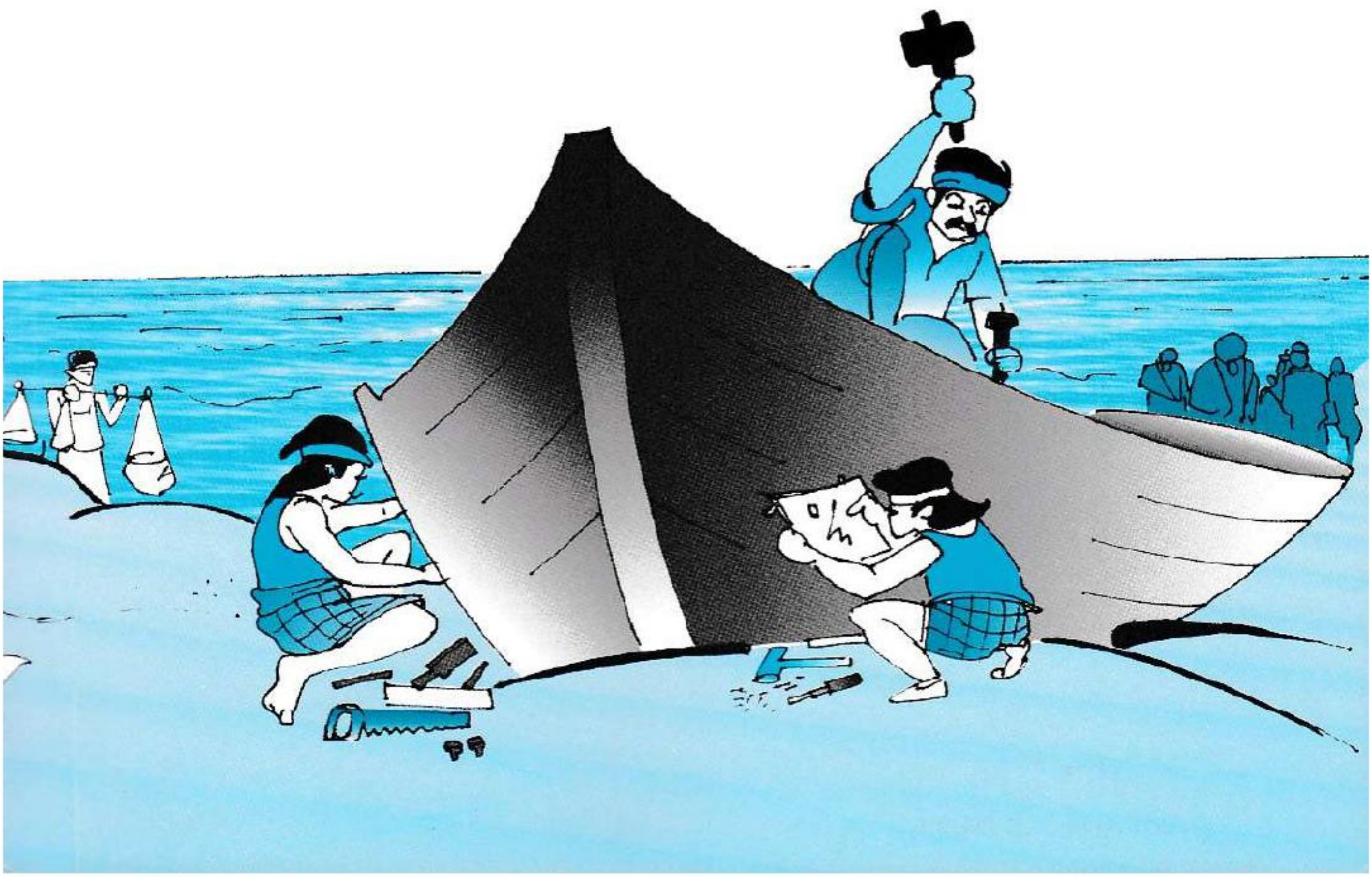
মেরি তার মুখ মুছে নিল। তাকে এখন বেশ শান্ত মনে হল, আর দীপা তাতে খুব খুশি হল।

পরের সপ্তাহে, দীপার আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। মেরি আর দীপা তাদের সাথে সমুদ্রসৈকতে একটি দিন কাটাতে গেল। দীপা সাথে করে পেন্সিল, কাগজ, রং আর তুলি নিয়ে গেল।

তাদের চারপাশেই সমুদ্রসৈকতটি নানা রকম কর্মকাণ্ডে সরগরম হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন জেলে তাদের নৌকা মেরামত করছিল। অন্যরা তাদের ধরা মাছ তীরে নিয়ে আসছিল। মেরি, দীপা এবং তার পরিবারের সবাই এতে দারুণ আনন্দ পেল! সবাই ছবি আঁকার সরঞ্জাম তুলে নিল এবং নিজের নিজের ছবি আঁকতে বসে গেল।

কেবল মেরি একটু ইতস্তত করল। "আমি তো ছবি আঁকতে জানি না!" সে বলল। কিছুক্ষণ সে অন্যদের ছবি আঁকা দেখল। কিন্তু শীঘ্রই সে ও ছবি আঁকায় মগ্ন হয়ে গেল।

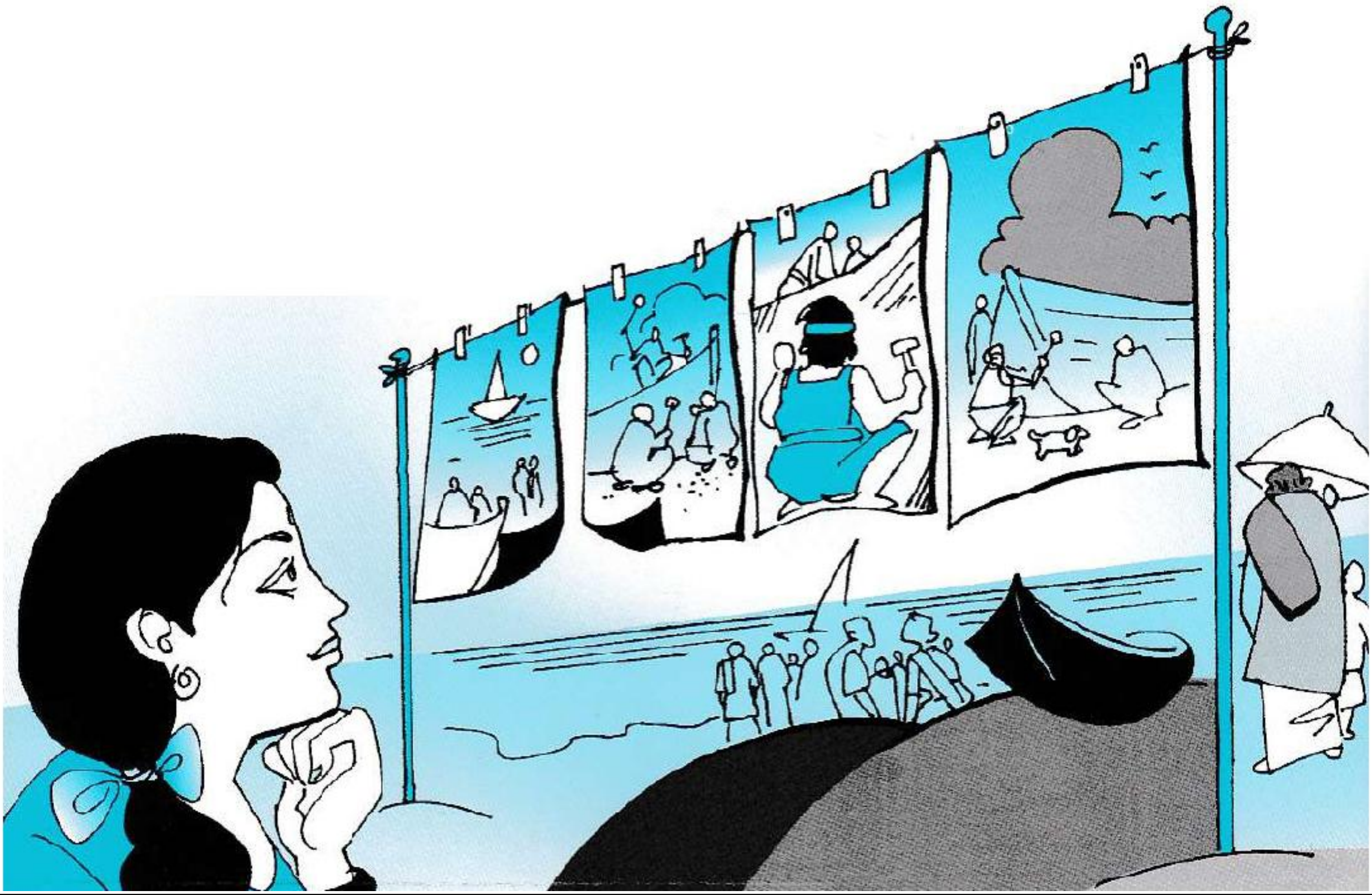
অবশেষে সবার ছবি আঁকা শেষ হল। ছবিগুলো শুকানোর জন্য টাঙিয়ে রাখা হল। আঁকা ছবিগুলো সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলো দেখল। কী আশ্চর্য!



তাদের সামনে ঠিক একই দৃশ্য ফুটে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিটি মানুষ সেই দৃশ্যটিকে নিজেদের মতন করে এঁকেছিল ও রাঙিয়েছিল। মেরির মনে পড়ে গেল দীপার কথাগুলো। "আমরা সবাই একই দৃষ্টিতে দেখি না, কিংবা একই ভাবে ভাবি না—আর আমরা সবাই একই ভাবে ছবিও আঁকি না!"

"দীপা ঠিকই বলেছে!" সে বলল। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সে তার আঁকা ছবিটি হাতে তুলে নিল। এরপর সে সেই ছবিটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প বলতে শুরু করল। দীপা এবং বাকি সবাই তো অবাক! "তুমি যে কী চমৎকার গল্প বলতে পারো, মেরি!" তারা তাকে বলল। সেই দিনটি ছিল মেরির জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন।

সেই ঘটনার পর থেকে, মেরি সব কিছু সে ভাবেই আঁকে যে ভাবে সে তার নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পায়। অন্যরা কী বলবে তা নিয়ে সে আর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করে না। তার আত্মবিশ্বাস এখন অনেক বেড়ে গেছে এবং সে তার কাজ বেশ উপভোগ করে। আর ছবি আঁকা শেষ করার পর, সে সেই ছবিগুলোকে ঘিরে একের পর এক চমৎকার সব গল্প শোনায়!



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!

একদিন একটি ছোট খরগোশ একটি তালগাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল।

কাছেই, একটি উঁচু বেলগাছ থেকে একটি বেল নিচে খসে পড়ল। বেলটি তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝনঝন শব্দ করতে করতে মাটিতে এসে পড়ল। মাটিতে থাকা একটি পাথরের সাথে বেলের শক্ত খোসাটির ধাক্কা লাগতেই 'ঠক' করে একটি শব্দ হলো।

শব্দ শুনে খরগোশটি ধড়মড় করে জেগে উঠল। "ওহ, সর্বনাশ!" সে মনে মনে ভাবল। "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!" এই ভেবে সে দৌড়াতে শুরু করল।

একে একে অন্য খরগোশগুলোও তার পিছু নিল। তাদের কেউই জানত না তারা কেন দৌড়াচ্ছে!

একটি হরিণ তাদের ছুটে আসতে দেখল। "তোমরা সবাই দৌড়াচ্ছ কেন?" সে জিজ্ঞেস করল। "তোমাদের পেছনে কি কেউ তাড়া করেছে?" ছোট খরগোশটি উত্তর দিল, "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! দৌড়াও! দৌড়াও!" তাই হরিণটিও দৌড়াতে শুরু করল।



রাস্তার পাশে একটি ভালুক দাঁড়িয়ে ছিল। "হরিণ, তুমি এভাবে দৌড়াচ্ছ কেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

"তোমারও দৌড়ানো উচিত! পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!" হরিণটি বলল। সে ভালুকটিকে পাশ কাটিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল এবং দৌড়াতে থাকল।

এবার ভালুকটিও দৌড়াতে শুরু করল। একটি শিয়াল তাকে ডেকে বলল, "ভালুক ভাই! কী হয়েছে? তুমি দৌড়াচ্ছ কেন?"

"পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! নিজেকে বাঁচাও!" ভালুকটি পেছন থেকে চিৎকার করে বলল।

আরও অনেক প্রাণী তাদের সাথে যোগ দিল। শিয়ালের পর এল ষাঁড়। তারপর এল শূকর, গণ্ডার, হাতি এবং বাঘ।



সিংহ তাদের ছুটে আসতে দেখে ভাবল, 'এ কী কাণ্ড? বাঘ আর হরিণ, ভালুক আর শূকর, শিয়াল আর খরগোশ—সবাই মিলে একসাথে দৌড়াচ্ছে?'

"থামো!" সে গর্জন করে বলল। "তোমরা সবাই দৌড়াচ্ছ কেন?"



বাঘের নিঃশ্বাসে তখনো এতটুকু জোর বাকি ছিল যে সে উত্তর দিতে পারল, "পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! দৌড়াও! দৌড়াও!"

"ফেটে যাচ্ছে? পৃথিবী?" সিংহ মনে মনে ভাবল। "আমি এটা বিশ্বাস করি না। এই প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিছু একটা এদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে... আমাকে অবশ্যই এটা থামাতে হবে!"



এরপর সে গর্জন করে উঠল। একবার নয়, দুবার নয়—বরং তিনবার: "গোওওওম! গোওওওম গোওওওম!"

অবশেষে ছুটে চলা পশুদের সেই ভিড়টি থেমে গেল। সিংহ তাদের জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কে বলল যে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে?"

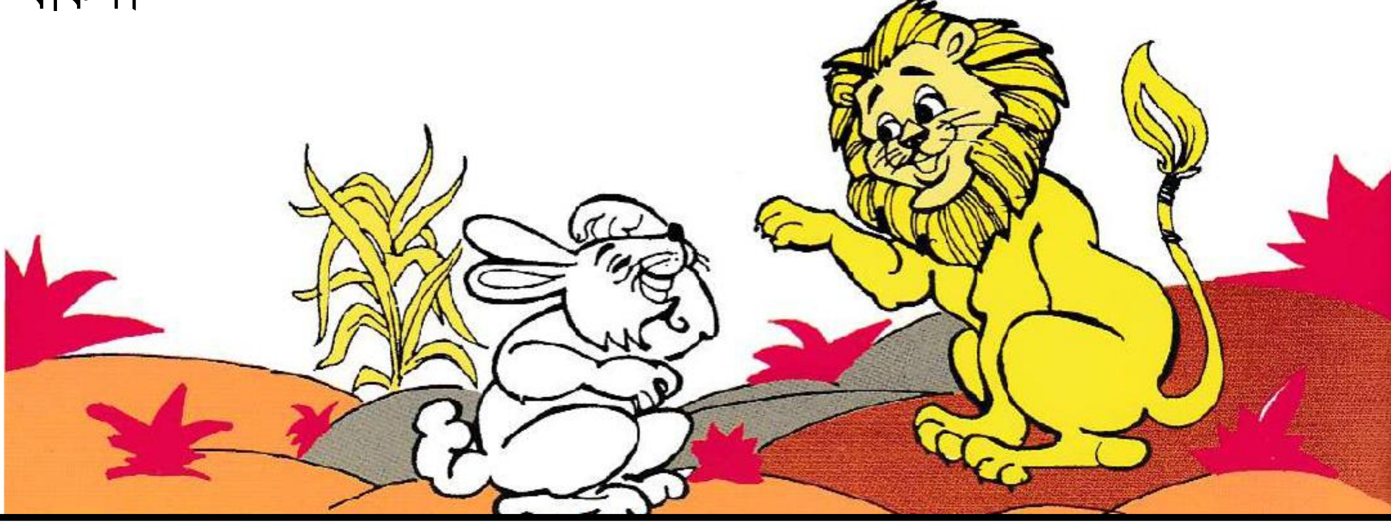
বাঘটি এগিয়ে এল। সে বলল, "হাতি আমাকে বলেছে।" সিংহ হাতিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কে বলল যে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে?" হাতি বলল, "গণ্ডার আমাকে বলেছে।"

এরপর গণ্ডার, শূকর, ষাঁড়, শেয়াল, ভালুক এবং হরিণ—সবাই একে অপরের নাম বলল। এবার খরগোশের পালা এল। সে বলল, "হ্যাঁ! আমি নিজেই শুনেছি পৃথিবী ফেটে যাওয়ার শব্দ!"

সিংহ জিজ্ঞেস করল, "এটা কোথায় হয়েছিল? আমাকে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও যেখানে তুমি ওই শব্দ শুনেছ।" খরগোশ পথ দেখিয়ে তালগাছটির কাছে নিয়ে গেল। আর সেখানে সবার চোখের সামনেই পড়ে ছিল সেই বেলফলটি, যা নিচে পড়ে ফেটে গিয়েছিল।

ঠিক তখনই তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝনঝন শব্দ করে আরেকটি বেলফল মাটিতে এসে পড়ল। 'ঠক' শব্দ করে সেটিও ফেটে গেল।

সিংহ হেসে বলল, "এই শব্দটাই খরগোশ শুনেছিল।" খরগোশও তার সাথে হেসে উঠল। এরপর বাকি সব পশুরাও হাসিতে যোগ দিল। তারা একে অপরকে বলল, "মজাটা তো আমাদের নিয়েই হল!" তারা হাসতেই থাকল।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

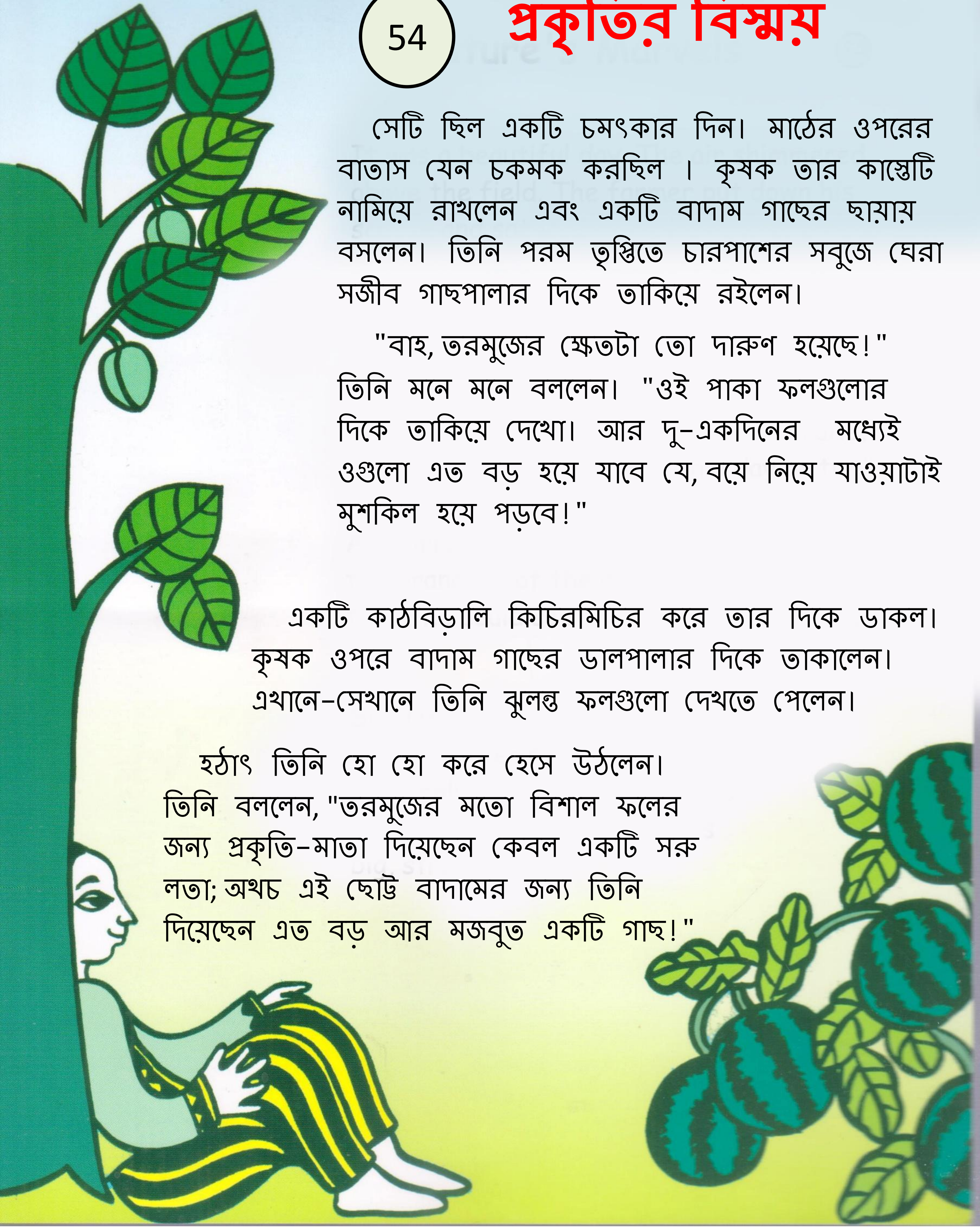
54 প্রকৃতির বিস্ময়

সেটি ছিল একটি চমৎকার দিন। মাঠের ওপরের বাতাস যেন চকমক করছিল । কৃষক তার কাস্তেটি নামিয়ে রাখলেন এবং একটি বাদাম গাছের ছায়ায় বসলেন। তিনি পরম তৃপ্তিতে চারপাশের সবুজে ঘেরা সজীব গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বাহ, তরমুজের ক্ষেতটা তো দারুণ হয়েছে!" তিনি মনে মনে বললেন। "ওই পাকা ফলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। আর দু-একদিনের মধ্যেই ওগুলো এত বড় হয়ে যাবে যে, বয়ে নিয়ে যাওয়াটাই মুশকিল হয়ে পড়বে!"

একটি কাঠবিড়ালি কিচিরমিচির করে তার দিকে ডাকল। কৃষক ওপরে বাদাম গাছের ডালপালার দিকে তাকালেন। এখানে-সেখানে তিনি ঝুলন্ত ফলগুলো দেখতে পেলেন।

হঠাৎ তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "তরমুজের মতো বিশাল ফলের জন্য প্রকৃতি-মাতা দিয়েছেন কেবল একটি সরু লতা; অথচ এই ছোট্ট বাদামের জন্য তিনি দিয়েছেন এত বড় আর মজবুত একটি গাছ!"



কথাটির ওপর জোর দিতে তিনি গাছের গুঁড়িতে একটি চাপড় দিলেন।—হঠাৎ, ওপর থেকে একটি বাদাম সোজা তার মাথার ওপর এসে পড়ল!

কৃষক তো হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর তিনি বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, "আহ! বাদাম গাছের ফলগুলো যদি তরমুজের আকারের হতো, তবে তো আজ আমার জীবনই শেষ হয়ে যেত! কী অলৌকিকভাবেই না আমি বেঁচে গেলাম!"

তিনি গাছটির নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন এবং প্রকৃতির এই রহস্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন।

ইরানের একটি লোককথা

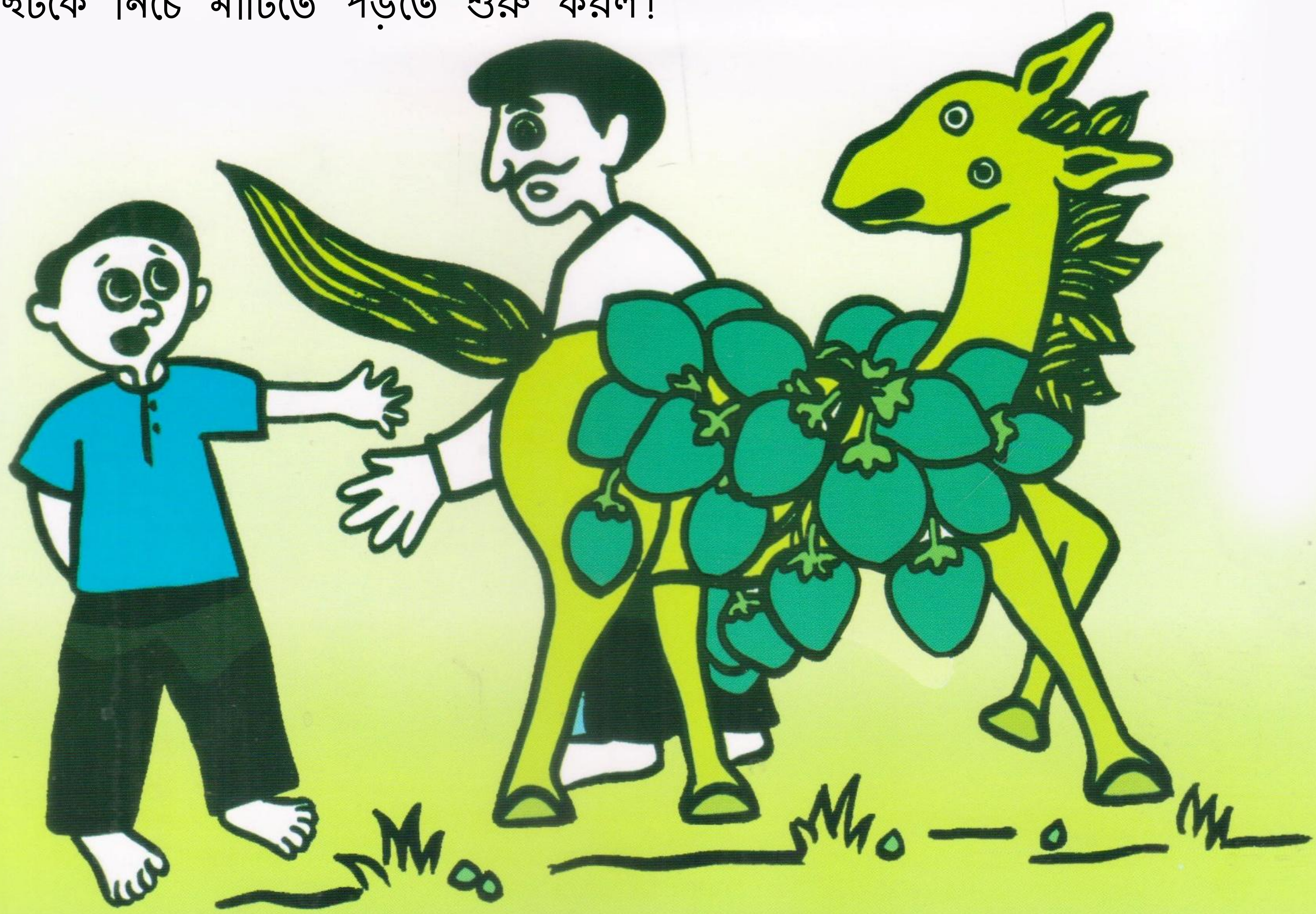


পথিক ও ডাব

মার্কোস এক গোছা ডাব নিয়ে কৃষকদের বাজারে যাচ্ছিলেন। তিনি বেশ তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলেন। গলিতে একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর ঘোড়াটি থামালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "বাজারে পৌঁছাতে আমার আর কতক্ষণ সময় লাগবে?"

ছেলেটি গভীর চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে ঘোড়ার পিঠে স্তূপ করে রাখা ডাবগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, "আপনি যদি খুব দ্রুত যান, তবে আপনার পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যাবে। আর আপনি যদি ধীরে-সুস্থে যান, তবে শীঘ্রই সেখানে পৌঁছে যাবেন।"

ছেলেটির কথা শুনে মার্কোস তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। "এই ছেলেটা বেচারা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে!" তিনি মনে মনে ভাবলেন। ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে দ্রুত পায়ে হাঁটিয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। আর ঠিক তখনই ঘটল সেই বিপত্তি! ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাবগুলো ছিটকে নিচে মাটিতে পড়তে শুরু করল!



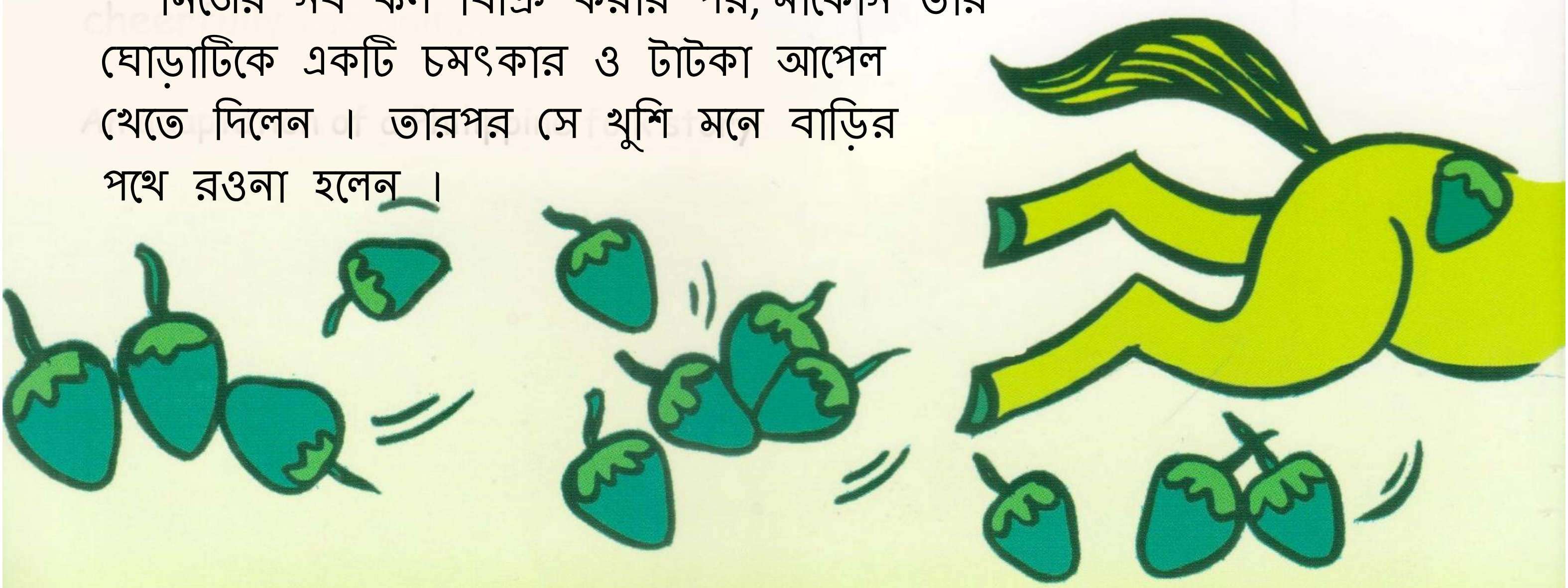
বেচারা মার্কোস ঘোড়াটি থামালেন এবং নিচে পড়ে যাওয়া ফলগুলি কুড়িয়ে আনার জন্য ছুটে গেলেন। দ্রুত সেগুলো আবার বেঁধে নিয়ে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। ওহ! আবার বেশ কিছু ডাব ছিটকে নিচে পড়ে গেল! সেগুলো গড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মার্কোস আবার ঘোড়াটি থামালেন। তিনি আবার নিচে পড়ে যাওয়া ফলগুলি কুড়িয়ে নিলেন ও আবার সেগুলিকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিলেন। এবার তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন এবং ঘোড়াটিকে চলতে বাধ্য করার জন্য তার দড়ি ধরে সজোরে টান দিলেন । কিন্তু ঘোড়াটি হঠাৎ পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল আর তার পিঠ থেকে সবকটি ডাব নিচে ফেলে দিল!

মার্কোসের তখন কেঁদেই ফেলার মতো অবস্থা। কিন্তু তা না করে, তিনি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন এবং সেই ছেলেটির বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলেন । তারপর তিনি বলে উঠলেন , "আমি বুঝতে পেরেছি!"

সবকটি ডাব ঘোড়ার পিঠে খুব শক্ত করে বেঁধে নিয়ে, তিনি এবার ধীরেসুস্থে ও অত্যন্ত যত্নসহকারে ঘোড়াটিকে পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন । আর সত্যিই, বাজার বন্ধ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি সেখানে পৌঁছে গেলেন ।

নিজের সব ফল বিক্রি করার পর, মার্কোস তার ঘোড়াটিকে একটি চমৎকার ও টাটকা আপেল খেতে দিলেন । তারপর সে খুশি মনে বাড়ির পথে রওনা হলেন ।



একটি ফিলিপিনো লোককাহিনির রূপান্তর

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Sripama Tamhane
Artist Uma Krishnaswamy

নেভারস্পেন্ড এবং নেভারলেন্ড

নদীর ধারের এক গ্রামে দুই প্রতিবেশী বাস করত, যারা সবসময় ঝগড়া করত। তবে তা কোনো সম্পত্তি, টাকা–পয়সা বা এমন কিছুর জন্য নয়। না! তারা একে অপরের চেয়ে এতটাই আলাদা স্বভাবের ছিল যে, তাদের পক্ষে সহজে মিলেমিশে থাকা সম্ভব ছিল না।

এক প্রতিবেশী অন্য কাউকে সাহায্য করার জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে চাইত না। আর অন্য প্রতিবেশী তো নিজেকে সাহায্য করার জন্যও একটি পয়সা খরচ করতে চাইত না । সে বরং জিনিসপত্র ধার করতেই বেশি পছন্দ করত।

গ্রামবাসীরা তাদের দুটি ডাকনাম দিয়েছিল। তারা প্রথম প্রতিবেশীকে ডাকত 'নেভারলেন্ড' (Neverlend)—অর্থাৎ যে কখনো ধার দেয় না—আর দ্বিতীয়জনকে ডাকত 'নেভারস্পেন্ড' (Neverspend)—অর্থাৎ যে কখনো খরচ করে না।

একদিন বৃষ্টির দিনে, নেভারলেন্ড যখন বাড়ি ফিরছিল, ঠিক তখনই নেভারস্পেন্ড বাইরে যাচ্ছিল। নেভারস্পেন্ড বলল, "ভাই, তোমার ছাতাটা আমাকে একটু ধার দেবে? আমার নিজের কোনো ছাতা নেই।"





কিন্তু নেভারলেন্ড বলল, "আমি যদি তোমাকে আমার ছাতাটা ধার দিই, তবে তুমি নিজের জন্য আর কখনোই ছাতা কিনবে না। তুমি ছাতা ধার করেই কাটিয়ে দেবে—যতদিন না তুমি এতটাই বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়ো যে, ঘর থেকে বের হওয়ারই আর ক্ষমতা থাকবে না!"

তবুও নেভারস্পেন্ড কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়ল। সে বৃষ্টিতে ভিজে চপচপে হয়ে গেল। কিন্তু একটি ছাতাও কিনল না!

আরেকবার, তাদের দুজনের ডাকঘরের সামনে দেখা হল। নেভারস্পেন্ড একটি চিঠি লিখতে চাইছিল। সে নেভারলেন্ডের কাছে একটি কলম চাইল। কিন্তু সেই নেভারলেন্ড—আপনি কি অনুমান করতে পারেন সে কী বলল?

"প্রিয় প্রতিবেশী, আমি যদি তোমাকে এভাবেই জিনিসপত্র ধার দিতে থাকি, তবে তোমার স্বভাব কখনোই পাল্টাবে না! বাড়ি যাও এবং নিজের একটি কলম নিয়ে এসো!"



নেভারস্পেন্ড তখন অন্য একজনের কাছ থেকে একটি কলম ধার করে নিল। "কী ভীষণ কিপটে ওই নেভারলেন্ডটা!" সে মনে মনে বলল। "একদিন আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেবই!"

খুব শীঘ্রই তার সেই সুযোগ এসে গেল। তারা দুজন পাশের গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছিল। নদীর ওপরের সেতুটি পার হওয়ার সময়, নেভারলেন্ড পড়ে গেল। সে সোজা নদীর জলের মধ্যে ছিটকে পড়ল!

"বাঁচাও! বাঁচাও!" সে চিৎকার করে উঠল। "আমি সাঁতার জানি না!"

আর সেই নেভারস্পেন্ড! সে বলল: "প্রিয় নেভারলেন্ড! আমি যদি তোমাকে এখন উদ্ধার করি, তবে তুমি আর কখনোই সাঁতার শেখার চেষ্টা করবে না! তোমার নিজের ভালোর জন্যই আমি তোমাকে উদ্ধার করতে অস্বীকার করছি!"

আর এভাবেই তার প্রতিবেশীকে জলের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নেভারস্পেন্ড সেখান থেকে হেঁটে চলে গেল!



নেভারস্পেন্ডের কথাগুলো নেভারলেন্ডের হৃদয়ে গিয়ে বিঁধল। সে যেন নিজের কন্ঠস্বরই সেই কথাগুলোর মধ্যে শুনতে পেল। তখন সে নেভারস্পেন্ডের কাছে ক্ষমা চাইল। "আমাকে ক্ষমা করো!" সে আর্তনাদ করে উঠল। "আমি তোমাকে বড্ড বেশি জ্ঞান দিয়েছি। আমি আর কখনোই এমনটা করব না! দয়া করে আমাকে ডুবে মরতে দিও না!"

মুহূর্তের মধ্যেই, 'নেভারস্পেন্ড' (Neverspend) জলে ঝাঁপ দিল। সে তার প্রতিবেশীকে ধরে নদীর তীরে টেনে তুলল। সে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল এবং পরার জন্য পরিষ্কার পোশাক দিল। সে তার জন্য চা বানিয়ে আনল। এরপর সে নিজেও পরিষ্কার পোশাক পরে নিল। সূর্যের নিরাময়কারী কিরণ গায়ে মাখার জন্য তারা দুজনে একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল।

অচিরেই সেই দুই প্রতিবেশী একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া হতোও, তবে তা ছিল কেবলই খুনসুটি। ধীরে ধীরে তারা উভয়েই পরিবর্তিত হতে শুরু করল। এবং একদিন, গ্রামের অন্য বাসিন্দারা তাদের আসল নাম ধরে ডাকতে শুরু করল – মুরুগান এবং কান্ধন ।

তামিলনাড়ুর একটি গল্প



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

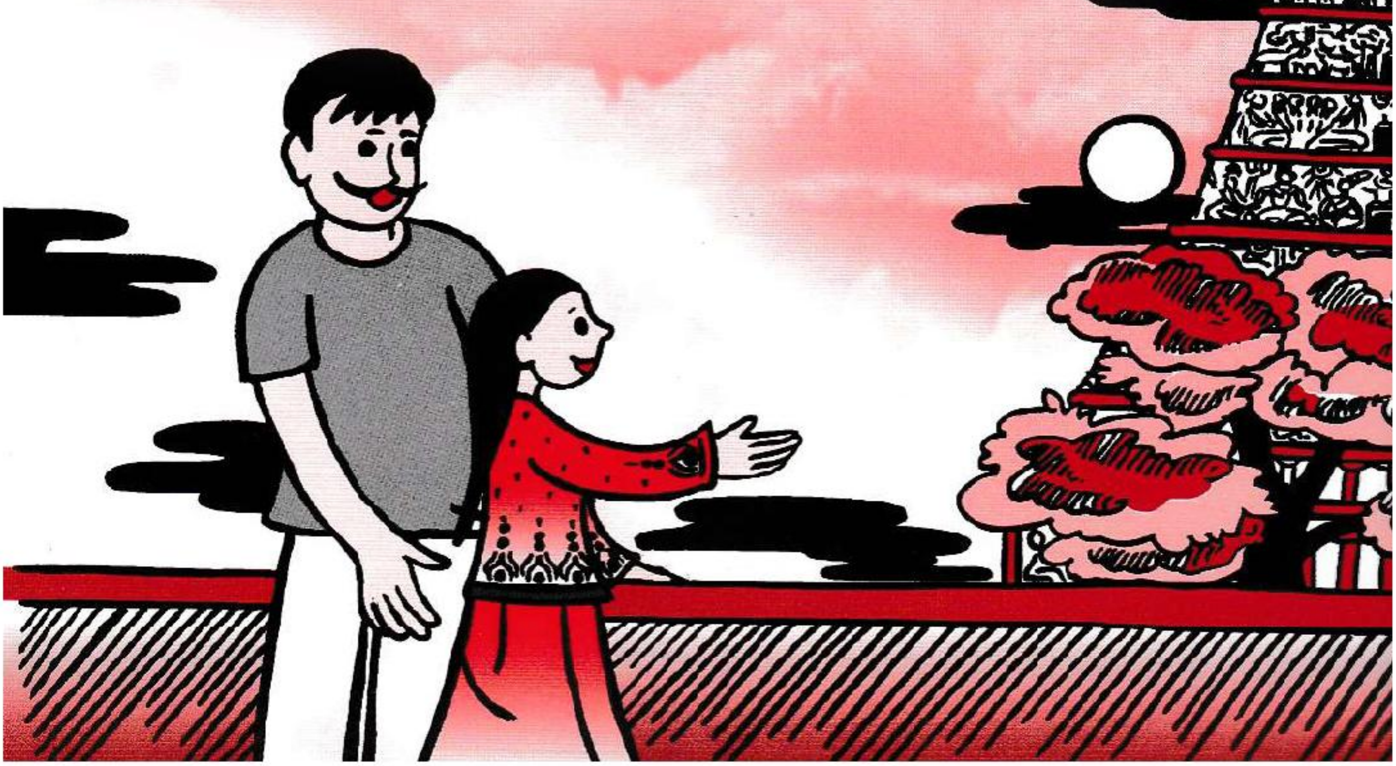
নিখোঁজ চাঁদ

ছোট্ট মেয়েটির চোখে জল জমে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"এত মন খারাপ কোরো না, কান্নাম্মা!" তার বাবা আলতো স্বরে বললেন। "তোমার জন্মদিনের আগেই আমি ফিরে আসব!" কিন্তু কান্নাম্মা ঘুরে তাকাল না।

"ওই দেখো! মন্দিরের গোপুরমের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে!" তিনি বললেন। "দেখো তো আজ রাতে চাঁদটা কত সুন্দর গোল হয়ে আছে। শীঘ্রই এটি তার এই সুন্দর গোল আকৃতি হারিয়ে ফেলবে। এটি ক্রমশ ছোট হতে শুরু করবে। অবশেষে এটি একটি সরু বাঁকা ফালির মতো হয়ে যাবে। তারপর একসময় এটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

কথাটা বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করল! কান্নাম্মা ঘুরে তাকাল, আর চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তার চোখের জল চিকচিক করে উঠল। ওহ, চাঁদটা কী অপূর্ব সুন্দর! তার বাবা মেয়ের মনের অবস্থার এই পরিবর্তনটি দ্রুতই বুঝতে পারলেন এবং বললেন, "চাঁদ আবার বড় হতে শুরু করবে—ধীরে ধীরে—যতক্ষণ না এটি তার সেই সুন্দর গোল আকৃতিটি ফিরে পায়! আর ঠিক তখনই তোমার জন্মদিন এসে উপস্থিত হবে!"



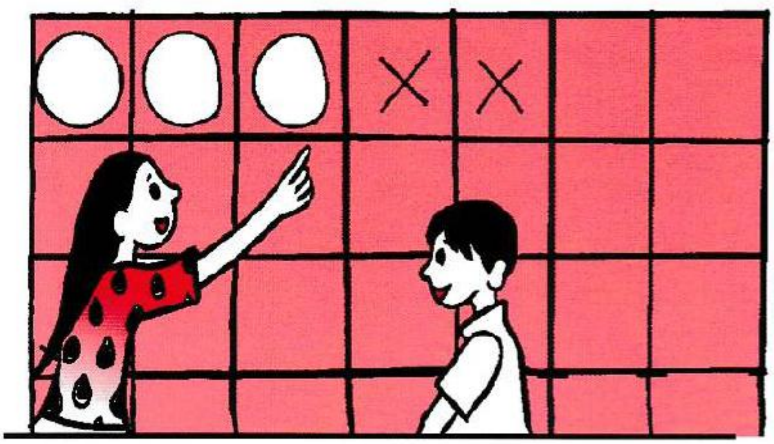
তার বাবা তাকে হাসানোর চেষ্টা করে বললেন,"তুমি কি জানো যে মানুষ ক্যালেন্ডার তৈরির জন্য চাঁদের আকৃতিকে কাজে লাগায়? আসলে, ইংরেজি 'month' (মাস) শব্দটি এসেছে 'moon' (চাঁদ) শব্দটি থেকেই! হুম... হয়তো আমাদের এখন থেকে 'moonth' (মুনথ) বলা শুরু করা উচিত।"

কান্নাম্মা হেসে উঠল! "আমি যখন বাইরে থাকব, তখন তুমি একটা 'চাঁদের ক্যালেন্ডার' তৈরি কর না!" তার বাবা বললেন । "তোমাকে যা করতে হবে তা হলো এই: দেয়ালের ওপর একটি ছক এঁকে নাও। এটি দেখতে অনেকটা ক্যালেন্ডারের একটি পাতার মতোই হবে। ছকটির প্রথম ঘরটিতে চাঁদের একটি ছবি আঁকো—ঠিক যেমনটি আজ রাতে দেখা যাচ্ছে—একেবারে গোল এবং নিখুঁত।

"প্রতি রাতে চাঁদের আকৃতিটি ভালো করে দেখবে । আগামীকাল রাতে এর আকৃতিটি কিছুটা ভিন্ন দেখাবে। সেই নতুন আকৃতিটি ছকের দ্বিতীয় ঘরটিতে এঁকে ফেলবে। প্রতি রাতেই চাঁদের একটি নতুন আকৃতি তৈরি হবে। এভাবে নতুন নতুন আকৃতি দিয়ে ছকের ঘরগুলো পূরণ করতে থাকবে।" "তোমার ক্যালেন্ডার শেষ হওয়ার অনেক আগেই আমি ফিরে আসব!" তিনি কথা দিলেন ।

ট্রেন এসে থামল। কান্নাম্মার বাবা ট্রেনে উঠলেন। ওই দেখো! কান্নাম্মা খুশিমনে হাত নাড়ছে। তার বাবাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

কান্নাম্মার নতুন প্রকল্পটি ছিল বেশ শক্ত। সবার আগে তো একটা ছক আঁকতে হবে! পাশের বাড়ির ছেলে থাম্বি তাকে সাহায্য করার জন্য খুব উৎসুক ছিল। দুজনে মিলে সেই ছকটি এঁকে ফেলল।



কান্নাম্মা অধীর আগ্রহে রাতের আঁধার নামার অপেক্ষা করতে লাগল এবং মন্দিরের গোপুরমের ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে, দীর্ঘ অপেক্ষার পর, দেখা মিলল তার, সেই চাঁদের!

কিন্তু এক মিনিট দাঁড়াও! চাঁদটা তো এখনো গোলই দেখাচ্ছিল! কান্নাম্মা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল । সে আবার ওপরের দিকে তাকাল। ওহ! বাবা ঠিকই বলেছিলেন! চাঁদটা আর পুরোপুরি গোল নেই—অন্তত এখন আর নেই!

কান্নাম্মা তার খড়ির টুকরোটি হাতে নিল এবং ছবিটা আঁকার জন্য দেয়ালের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু চাঁদের কোন দিকটা পুরোপুরি গোল ছিল না? সে তো সেটা ভুলেই গেছে। সে আবার ফিরে গেল, চাঁদটা আরেকবার দেখার জন্য। আহা, এবার সে বুঝতে পেরেছে! সে সেই পুরোপুরি গোল না হওয়া চাঁদের প্রথম ছবিটি আঁকল।

পরের সন্ধ্যায় সে তার এই প্রকল্পের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ঠিক তখনই থাম্বি ছুটে এল। "চাঁদটা তো আরও ছোট হয়ে গেছে!" "এসো, দেখে যাও!" সে চেঁচিয়ে বলল। হ্যাঁ, চাঁদ সত্যিই ছোট হয়ে গেছে! কান্নাম্মা খুব যত্ন করে চাঁদের দ্বিতীয় ছবিটি আঁকল।

তৃতীয় রাতে সে গোপুরমের ওপর চাঁদকে দেখতে পেল না। সে বেশ অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আবার ঘরের ভেতরে ফিরে গেল। ঠিক ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে আরেকবার বাইরে এল—আর তখনই সেটিকে দেখতে পেল; আগের রাতের চেয়ে এটি আরও কিছুটা ছোট হয়ে গেছে!

হুম। এ এক রহস্যময় চাঁদ! কান্নাম্মা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সেই—পুরোপুরি গোল নয় এমন—চাঁদের তৃতীয় ছবিটি আঁকল। চাঁদের ক্যালেন্ডারটি ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠছিল!

চতুর্থ ও পঞ্চম রাতে বৃষ্টি হল। মন খারাপ করে ক্যালেন্ডারের ছকের দুটি ঘর খালিই রেখে দিতে হল। ষষ্ঠ রাতে আকাশ পরিষ্কার ছিল । কান্নাম্মা যখন বাইরে এল, তখন আকাশে শত শত—না, হাজার হাজার—তারা মিটমিট করে জ্বলছিল। কিন্তু চাঁদ সেখানে ছিল না! সে বারবার বাইরে গিয়ে চাঁদ আছে কি না তা পরীক্ষা করতে লাগল। চাঁদ নেই, চাঁদ নেই, কোথাও চাঁদ নেই!

তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। কান্নাম্মা আর চোখের পাতা খোলা রাখতে পারছিল না। সেই রাতে সে স্বপ্ন দেখল যে, এক রাক্ষস চাঁদটিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। সে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল। চাঁদটা তবে কোথায় গেল?

আগামীকাল কি সেটি আবার ফিরে আসবে?

ফিরে এল না! এমনকি তার পরের রাতেও নয়! হয়তো চাঁদটা সত্যিই চুরি হয়ে গেছে! থাম্বি বলল, "যে-ই চাঁদটা চুরি করে থাকুক না কেন, সে নিশ্চয়ই সেটি ফেরত দিয়ে যাবে। চাঁদ এতো বড় যে তাকে বয়ে বেড়ানোটা বড্ড কঠিন কাজ!"

কী বোকা ছেলে! কান্নাম্মা মনে মনে হাসল। সেই রাতেও সে জেগে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। চাঁদের দেখা মিলল না! যখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন সে তার মায়ের কন্ঠস্বর শুনতে পেল। "আগামীকাল বাবা বাড়ি ফিরবেন।" সে স্বপ্ন দেখল যে, তার বাবা একটি জাদুর তলোয়ার ঘুরিয়ে রাক্ষসের হাত থেকে চাঁদটিকে উদ্ধার করছেন!

পরদিন সকালে কান্নাম্মা ঘুমজড়ানো চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস তার ঘুম পুরোপুরি তাড়িয়ে দিল; সে আকাশের দিকে তাকাল। "মা!" সে চেঁচিয়ে উঠল। "চাঁদ ফিরে এসেছে!" "চাঁদ ফিরে এসেছে!" কান্নাম্মার মা দেখতে দরজার কাছে এলেন। " সে এতই অলস যে, একেবারে ভোরবেলা এসে হাজির হয়েছে!" তিনি বললেন। দুজনেই হেসে উঠলেন। চাঁদটা এখন কেবল একটা অর্ধবৃত্তাকার রূপ ধারণ করেছে! আর সেটা মন্দিরের চূড়ার ওপর নয়, বরং ঠিক তাদের মাথার ওপরেই অবস্থান করছে।

কিছুটা দূরে কান্নাম্মা দেখতে পেল, তার বাবা বাড়ি ফিরছেন। জীবনটা যেন এখন পরিপূর্ণ। বাবা ফিরে এসেছেন। চাঁদকে খুঁজে পাওয়া গেছে। দেয়াল-ক্যালেন্ডারটি অপেক্ষায় আছে। কান্নাম্মার মনটা নানা ছবি আর প্রশ্নে ভরে উঠল। এখন থেকে সে খুব ভোরেই সেই 'অলস' চাঁদটাকে খুঁজতে বেরোবে

নিরুপমা রাঘবন



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

ডুম ডুম, ঢোল!



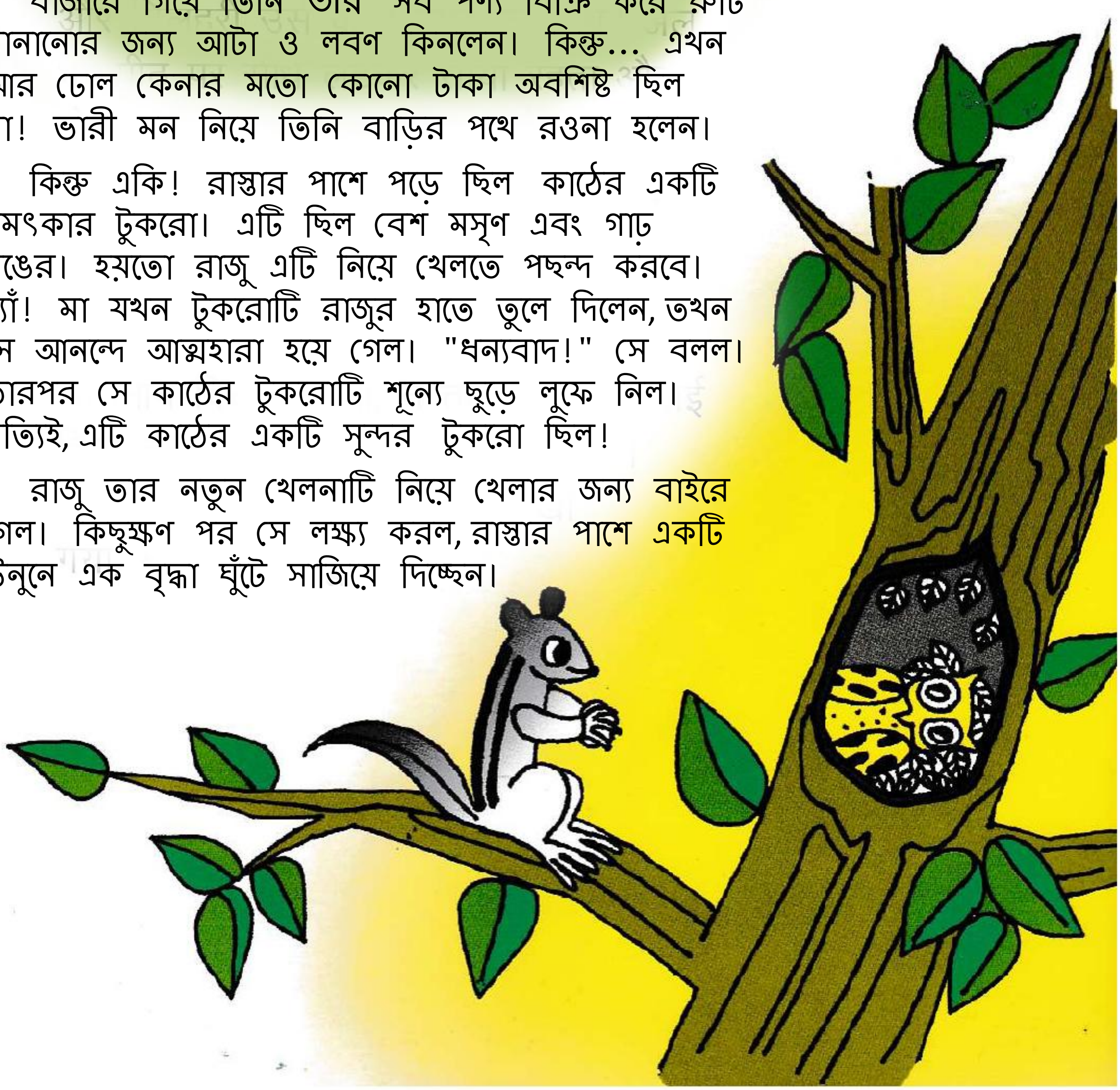
ডুম ডুম, ডুম ডুম... রাজু বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সেই শব্দের দিকে দৌড়ে গেল। ওই তো! মোড় ঘুরে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে আসছিল এক রঙিন শোভাযাত্রা!

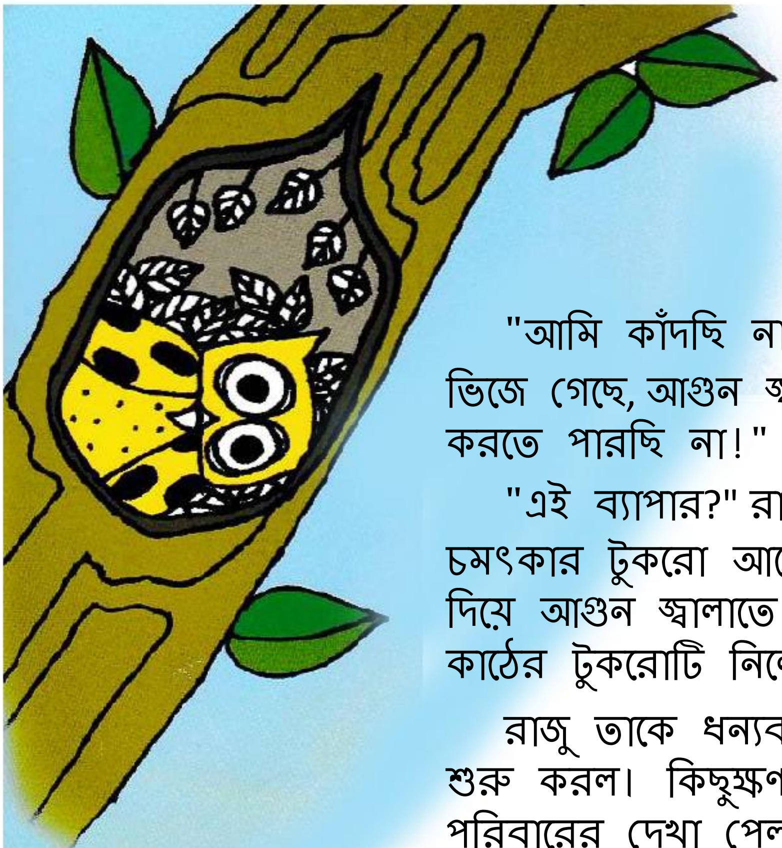
রাজু দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল এবং ঘরের ভেতরে ঢুকল। "মা! মা!" সে ডেকে উঠল। "দয়া করে আমাকে একটা ঢোল কিনে দাও!" তার মা ঠিক তখনই বাজারের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিলেন। "আমি চেষ্টা করব রাজু," তিনি বললেন।

বাজারে গিয়ে তিনি তাঁর সব পণ্য বিক্রি করে রুটি বানানোর জন্য আটা ও লবণ কিনলেন। কিন্তু... এখন আর ঢোল কেনার মতো কোনো টাকা অবশিষ্ট ছিল না! ভারী মন নিয়ে তিনি বাড়ির পথে রওনা হলেন।

কিন্তু একি! রাস্তার পাশে পড়ে ছিল কাঠের একটি চমৎকার টুকরো। এটি ছিল বেশ মসৃণ এবং গাঢ় রঙের। হয়তো রাজু এটি নিয়ে খেলতে পছন্দ করবে। হ্যাঁ! মা যখন টুকরোটি রাজুর হাতে তুলে দিলেন, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। "ধন্যবাদ!" সে বলল। তারপর সে কাঠের টুকরোটি শূন্যে ছুড়ে লুফে নিল। সত্যিই, এটি কাঠের একটি সুন্দর টুকরো ছিল!

রাজু তার নতুন খেলনাটি নিয়ে খেলার জন্য বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করল, রাস্তার পাশে একটি উনুনে এক বৃদ্ধা ঘুঁটে সাজিয়ে দিচ্ছেন।





উনুনের ভেতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছিল। আগুন কিছুতেই জ্বলছিল না! রাজু বৃদ্ধার চোখে জল দেখতে পেল। "দিদিমা!" সে ডেকে উঠল। "আপনি কাঁদছেন কেন?"

"আমি কাঁদছি না তো!" বৃদ্ধা বললেন। "এই ঘুঁটেগুলো ভিজে গেছে, আগুন জ্বলছে না, আর তাই আমি রান্নাও করতে পারছি না!"

"এই ব্যাপার?" রাজু বলল। "আমার কাছে কাঠের একটি চমৎকার টুকরো আছে। দয়া করে এটি নিন! আপনি এটি দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারবেন।" বৃদ্ধা তো মহাখুশি! তিনি কাঠের টুকরোটি নিলেন এবং রাজুকে একটি রুটি দিলেন।

রাজু তাকে ধন্যবাদ জানাল এবং রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সে এক কুমোর এবং তার পরিবারের দেখা পেল। কুমোরের শিশুটি কাঁদছিল।

"তোমার বাচ্চাটি কাঁদছে কেন?" রাজু জানতে চাইল। "ও ক্ষুধার্ত!" কুমোর উত্তর দিল। "আমার কাছে একটি রুটি আছে!" রাজু বলল। "এটা নাও!" সে শিশুটিকে উদ্দেশ্য করে বলল। কুমোরের স্ত্রী রাজুকে বললেন, "তুমি খুব ভালো ছেলে! এই নাও তোমার জন্য একটি মাটির পাত্র।" তিনি রাজুকে আশীর্বাদ করলেন।

রাজু তার মাটির পাত্রটি হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। সেখানে সে এক ধোপা ও তার স্ত্রীকে দেখতে পেল।





ধোপাটি বলছিল, "আমাদের শেষ হাঁড়িটাও ভেঙে গেল! জল ফোটানোর মতো আর কোনো হাঁড়ি আমাদের কাছে নেই। এখন আমরা কাপড়চোপড় ধোব কী করে?"

"চিন্তা কোরো না!" রাজু বলল। "এই হাঁড়িটা নাও!" ধোপাটি তাকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। সে রাজুকে একটি নরম উলের জামা উপহার দিল।

জামাটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার! রাজু সেটি পরে নিল। নিজেকে খুব সুদর্শন মনে করতে করতে সে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে একটি সেতুর কাছে এসে পৌঁছাল।

সেতুর ছায়ায় একটি লোক বসে ছিল, যে শীতে থরথর করে কাঁপছিল। তার গায়ে কোনো জামা ছিল না! রাজু অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে নিজের উলের জামাটি খুলে লোকটিকে দিয়ে দিল।

"তুমি তো দেখছি খুব বড় মনের মানুষ!" লোকটি বলল। "আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই... এই নাও!" সে রাজুর হাতে একটি দড়ির এক প্রান্ত তুলে দিল। "আমার ঘোড়াটা তুমিই নিয়ে নাও!" সে বলল।



নতুন ঘোড়াটিকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার সময় রাজুর সাথে একটি বরযাত্রী দলের দেখা হল। পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল এবং তাদের বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। একটি ছোট মেয়ে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, তারা কেন এভাবে অপেক্ষা করছে। "ঘোড়া ছাড়া আমরা বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা শুরুই করতে পারছি না!" তার মা তাকে বুঝিয়ে বললেন।



"আমার ঘোড়াটাই তোমরা নাও!" রাজু বলল। ওহ, তাদের সবার মুখে কী অপূর্ব হাসিই না ফুটে উঠল! বর রাজুকে ধন্যবাদ জানাল এবং বলল, "দয়া করে তোমাকে কিছু উপহার দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে!"

রাজু মনে একটি আকাঙ্খা নিয়ে শোভাযাত্রার বাদ্যকরদের দলের দিকে তাকাল। তারা তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি একপাশে নামিয়ে রেখেছিল। বাজানোর অপেক্ষায় পড়ে থাকা যন্ত্রগুলি যেন আমন্ত্রণ করছিল! "আপনার বাদ্যকরদের বলবেন আমাকে একটা ঢোল দিতে?" রাজু জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই!" বর সানন্দে রাজি হলো। সে বাদ্যকরদের দিকে ঘুরে একটি ঢোল চাইল। মুহূর্তের মধ্যেই একটি ঢোল রাজুর হাতে এসে পৌঁছাল! আর তারপর 'ডুম ডুম, ডুম ডুম, ডুম' শব্দ তুলতে তুলতে সে বাড়ির দিকে রওনা দিল!



উত্তর ভারতের একটি লোককথা

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy

ওটা কার লেজ?

এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, একটি ছোট বানর গাছ থেকে নিচে লাফিয়ে নামল এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। হঠাৎই সে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। মাটিতে একেবারে একা পড়ে ছিল শুধু একটি লেজ!

"এই লেজটা কার?" বানরটি সজোরে জিজ্ঞেস করল। "আমার উচিত এর মালিককে খুঁজে বের করা!" সে লেজটি তুলে নিল এবং বনের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কাছেরই একটি পুকুর থেকে একটি মাছ ভেসে উঠল। "এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল।

"না, এটা আমার নয়!" মাছটি বলল।

"আমার লেজ ছাড়া কি আমি এভাবে সাঁতার কাটতে পারতাম?" এই বলে সে দ্রুতবেগে সাঁতরে চলে গেল—জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সে তার লেজটি আগে পিছে নাড়াতে লাগল।





"তাহলে এই লেজটা কার?" ছোট বানরটি মনে মনে ভাবল। উত্তর হিসেবে একটি শব্দ ভেসে এল: "টুক! টুক! টুক!" ওহ! ওটা ছিল একটি কাঠঠোকরা পাখি। সে পোকা ধরার জন্য গাছে ঠোকর দিচ্ছিল!

"এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল।

"এই তো আমার লেজ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?" কাঠঠোকরাটি বলল। "এটা ছাড়া, আমি কি এভাবে গাছের ডালে বসে থাকতে পারতাম?" সে গাছের কাণ্ডের ওপর নিজের শক্ত লেজ দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে উপরে-নিচে ও ডানে-বামে লাফাতে লাগল, আর গাছের ছালের ভেতর পোকা খুঁজতে লাগল।

হঠাৎই একটি কাঠবিড়ালি গাছ থেকে নিচে নেমে এল। সে ছোট বানরটির কাছেই নামল এবং একটি বাদাম কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছুটে গেল।

"এই লেজটা কি তোমার?" ছোট বানরটি জিজ্ঞেস করল। "না!" কাঠবিড়ালিটি বলল। "এই যে আমার সুন্দর লেজ! এর লম্বা লোমগুলো চারপাশ জুড়ে খাড়া হয়ে থাকে—এর সাহায্যে আমি গাছের ডালে ডালে উড়ে বেড়াতে পারি এবং নিচে মাটিতে নেমে আসতে পারি!"

ছোট বানরটি গাছের মগডালের দিকে তাকাল। তার খুব ইচ্ছে হল গাছে চড়ে খেলতে! কিন্তু এই লেজটির আসল মালিকের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই ছোট বানরটি আরও কিছুটা পথ এগিয়ে চলল।

"দেখে-শুনে পথ চলো!" একটি কন্ঠস্বর ভেসে এল। ছোট বানরটি নিচের দিকে তাকাল।



ওহ, সর্বনাশ! ওটা ছিল একটি রাগী বিচ্ছু!

"আমাকে ক্ষমা করবেন," ছোট বানরটি বলল। "এই লেজটা কি আপনার?"

"তুমি তো আমার লেজটা বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ, তাই না?" বিচ্ছুটি উত্তর দিল। আর এই বলে সে তার লেজটি ঠিক ছোট বানরটির দিকে তাক করে ধরল! "আমি যদি তোমাকে হুল ফোটাই, তবে তুমি মারা যাবে!" সে সতর্ক করে দিল। "পালাও এখান থেকে!" "পালিয়ে যাও!"

ছোট্ট বানরটি তাই করল।

দৌড়ে যাওয়ার পথে, একটি মা খরগোশ তার ছানাদের নিয়ে বানরটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা সবাই লাফ দিয়ে তাদের গর্তে ঢুকে পড়ল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

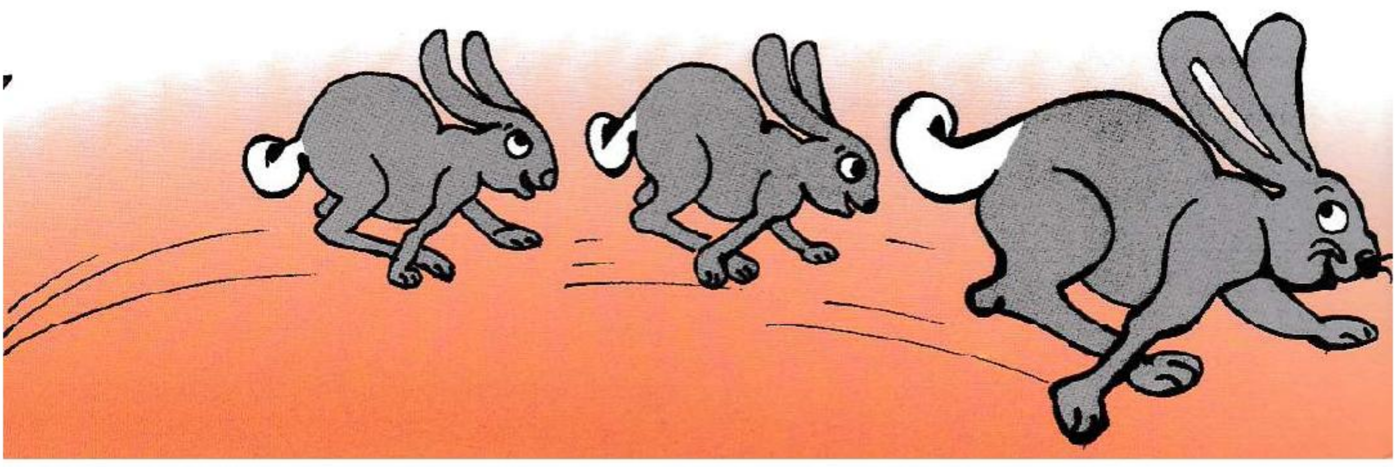
"মা খরগোশ!" ছোট্ট বানরটি নিচ থেকে ডেকে বলল। "তুমি কি তোমার লেজ খুঁজছ?"

মা খরগোশটি গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। "এই তো আমার লেজ। দেখো, আমি কীভাবে এটাকে মোচড়াই!" সে বলল।

"ওহ!" ছোট্ট বানরটি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল। "তোমার লোমগুলো বাদামী আর ধূসর রঙের, কিন্তু তোমার লেজটা সাদা। এটা কী দারুণ ছোট আর নরম-তুলতুলে!"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই!" খরগোশটি বলল। "আমি যখন দৌড়াই, তখন লেজটা এপাশ-ওপাশ নাড়াতে থাকি। এতে আমার শত্রুদের মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়—আর আমি পালিয়ে বাঁচি!"

"কী কাজের একটা লেজ!" ছোট্ট বানরটি মনে মনে ভাবল।



ঠিক তখনই নতুন কেউ সেখানে এল। সেটি ছিল একটি লেজহীন টিকটিকি! ছোট্ট বানরটি দৌড়ে তার কাছে গেল। "আমি তোমার লেজ খুঁজে পেয়েছি! এই যে সেটা!"

"ওটা আমারই লেজ ছিল," টিকটিকিটি বলল। "কিন্তু এখন ওটার আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তোমার ওটার প্রয়োজন নেই?" ছোট্ট বানরটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। "সেটা কীভাবে সম্ভব? লেজ ছাড়া মাছ সাঁতার কাটতে পারে না, কাঠঠোকরা গাছের গুঁড়ির ওপর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না, কাঠবিড়ালি লাফ দিয়ে মাটিতে নামতে পারে না, বিচ্ছু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, খরগোশ তার শিকারিদের হাত থেকে পালাতে পারে না—আর আমি? আমি তো গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে চলাফেরা করতেই পারি না ! সবারই তো একটা লেজ প্রয়োজন!"

"আমারও প্রয়োজন," টিকটিকিটি বলল। "কিন্তু গতকাল একটা সাপ আমাকে ধরে ফেলেছিল; তাই আমাকে বাধ্য হয়েই লেজটা খসিয়ে ফেলতে হয়েছিল। লেজটা যখন মাটিতে পড়ে মোচড়াচ্ছিল, সাপটা তখনই সেটাকে গিলে খেয়ে ফেলল। আর এভাবেই আমি পালিয়ে বাঁচলাম!"

"এটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" ছোট্ট বানরটি বলল। "কিন্তু তুমি কেন ওটা ফেরত পেতে চাইছ না?"

"দেখো!" টিকটিকিটি বলল। "আমার শরীরে এখনই একটা নতুন লেজ গজাতে শুরু করেছে!"

"ওহ!" ছোট্ট বানরটি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল। "সব প্রাণীর লেজের মধ্যে তোমার লেজটাই সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর!"



© Katha Jharna 2008 | Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati | V. Vijayakanthi | Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi | S. Rajalakshmi | Artist Uma Krishnaswamy

উৎসব প্রাঙ্গণে

সেদিন আমাদের ক্লাসে বেশ হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল! ছুটির ঘন্টা বাজার পর, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম। "আম্মা! আম্মা!" আমি ডাক দিলাম। "আগামী সপ্তাহে একটা স্কাউট ক্যাম্প হবে। আমি কি সেখানে যেতে পারি?"

"আমাকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ভাবে বল তো," মা বললেন।

"আসলে," আমি বললাম, "এটা শহরের ভেতরেই অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক বার্ষিক উৎসব চলাকালীন। গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে আসবে। আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের পথ দেখিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার।"

"শুনতে তো দারুণ লাগছে, মনি," মা বললেন। "কিন্তু তুমি তো এর আগে কখনো বাড়ির বাইরে রাত কাটাওনি। আমার যে কী ভীষণ চিন্তা হবে!"

"কমলা, রহিম এবং আরও অনেকেই তো যাচ্ছে," আমি মাকে আশ্বস্ত করে বললাম। "আম্মা, আমাকেও কি যেতে দেবে?"



"আচ্ছা, যদি ওরাও যায়..." মা তার কথা শেষ করার আগেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম "ধন্যবাদ, আম্মা!" আমি মনপ্রাণ দিয়ে বললাম।

যাত্রার দিন আমরা সবাই স্কুলের মাঠে সমবেত হলাম। আমরা আমাদের ভারী ব্যাগগুলো বাসে তুলে নিলাম। হাত নেড়ে বিদায় জানানো আর শুভকামনার মধ্যে দিয়ে আমরা স্কুলের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বড় রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। শহর পর্যন্ত পুরোটা পথ আমরা গান গাইতে গাইতে গেলাম।

যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু চারপাশের দৃশ্য দেখে আমরা তো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম! খাবারের আর হস্তশিল্পের দোকানগুলোর চারপাশে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। আমি এর আগে কখনো একসঙ্গে এত মানুষ দেখিনি, কিংবা এত ব্যস্ততাও দেখিনি।

বাস থেকে নামার পরই আমাদের একটি বিশাল খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে আমাদের তাঁবুগুলো খাটানোর অপেক্ষায় ছিল। এরপর পরদিন যার যা দায়িত্ব, তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হলো।

কমলা ভীষণ উচ্ছ্বসিত ছিল। তাকে চিকিৎসা কর্মীদের সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রহিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ট্রাফিক পুলিশদের সহায়তা করার। এ কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম; কারণ স্কুলে সে ছিল আমাদের সেরা ফুটবলার। কেবল তাকে দেখলেই দুর্বৃত্তরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেত ।

আমার নিজের দায়িত্বটি নিয়েও আমি বেশ খুশি ছিলাম। আমার কাজ ছিল নতুন দর্শনার্থীদের পথঘাট চিনিয়ে দেওয়া। আমি বরাবরই মানুষের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের কথা শুনতে পছন্দ করি ; আর এখন আমি সেই সুযোগটিই দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারব।



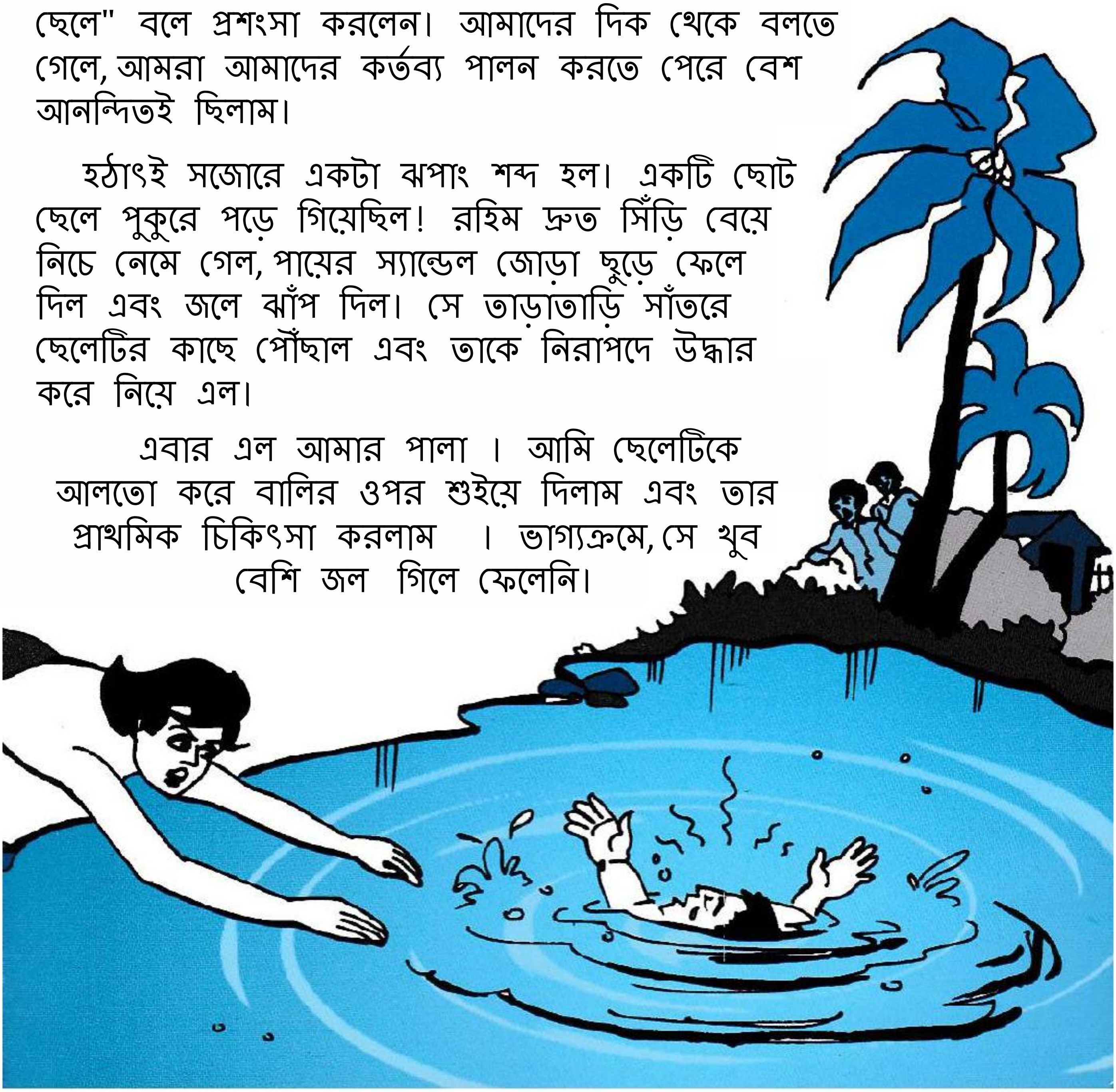
পরের দিনটি দেখতে দেখতেই কেটে গেল, অথচ সেই দিনটির স্মৃতিগুলো আজও আমার মনে অমলিন হয়ে আছে! আমরা সবাই খুব কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম এবং নতুন অনেক কিছু শিখেছিলাম। আমাদের যখন তাঁবুতে ফেরত পাঠানো হল, তখন আমরা সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম ।

একসাথে হেঁটে ফেরার পথে, রহিম আর আমি একে অপরকে আমাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনালাম। বরাবরের মতোই, রহিমের কাছে শোনানোর মতো একটা মজার গল্প ছিল। ঠিক যখন সে তার গল্প শেষ করল, আমরা দুজনেই লক্ষ্য করলাম মন্দিরের সিঁড়ির কাছে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাথে একটি ভারী ব্যাগ ছিল। স্বভাবতই, আমরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছুটে গেলাম।

রহিম তাঁর ব্যাগটি তুলে নিল, আর আমি তাঁর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে সাহায্য করলাম। সিঁড়ির উপরে পৌঁছে তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং আমাদের "ভালো ছেলে" বলে প্রশংসা করলেন। আমাদের দিক থেকে বলতে গেলে, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পেরে বেশ আনন্দিতই ছিলাম।

হঠাৎই সজোরে একটা ঝপাং শব্দ হল। একটি ছোট ছেলে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল! রহিম দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল, পায়ের স্যান্ডেল জোড়া ছুড়ে ফেলে দিল এবং জলে ঝাঁপ দিল। সে তাড়াতাড়ি সাঁতরে ছেলেটির কাছে পৌঁছাল এবং তাকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

এবার এল আমার পালা । আমি ছেলেটিকে আলতো করে বালির ওপর শুইয়ে দিলাম এবং তার প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম । ভাগ্যক্রমে, সে খুব বেশি জল গিলে ফেলেনি।



ইতিমধ্যে সেখানে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। লোকজন ছেলেটিকে দেখার জন্য গাদাগাদি করে এগিয়ে আসছিল। রহিম তাদের পেছনে সরে যেতে বলল। "ছেলেটির বাতাস দরকার!" সে বেশ জোরেই বলল। "দয়া করে একটু দূরে সরে দাঁড়ান!" এবার ছেলেটির বাবা-মা ভিড় ঠেলে সামনে আসতে পারলেন। তাঁরা দৌড়ে ছেলেটির কাছে গেলেন। তার বাবা তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং সজোরে জড়িয়ে ধরলেন।

শহরের হাসপাতালটি কাছেই ছিল। রহিম আর আমি সেই পরিবারটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম। ডাক্তার যখন ছেলেটিকে পরীক্ষা করছিলেন, আমরা তখন দুশ্চিন্তা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে, তিনি মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "তোমরা ছেলেরা দারুণ কাজ করেছ! তোমরা ঠিক সময়েই ছেলেটিকে জল থেকে তুলে এনেছ। তোমাদের দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসাই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে!" ছেলেটির বাবা-মা ছলছলে চোখে আমাদের ধন্যবাদ জানালেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমরা কমলার দেখা পেলাম। সে কাউকে একটি হুইলচেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আমাদের দেখতে পেল এবং হাত নেড়ে আমাদের অপেক্ষা করতে ইশারা করল। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের সাথে এসে যোগ দিল এবং আমরা সবাই মিলে একসাথে হেঁটে চললাম।



আমরা সবাই কত কিছুই না করেছি এবং দেখেছি! আর আমরা আমাদের স্কাউটিং দক্ষতা কাজে লাগিয়েছি! আমাদের প্রত্যেকের কাছেই শোনানোর মতো অনেক গল্প জমা হয়েছিল।

আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম এবং গল্পগুজব করলাম।

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

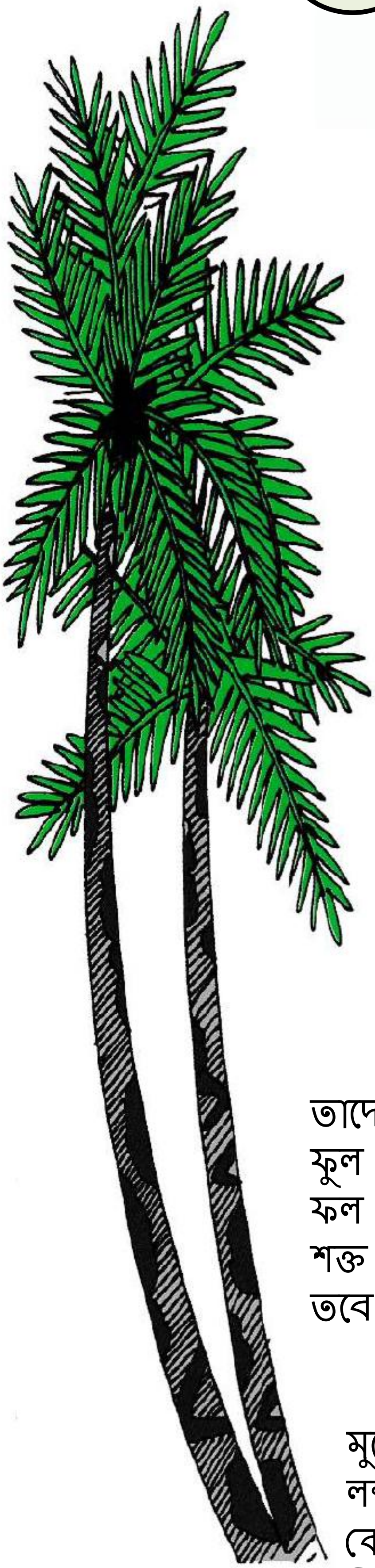
P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

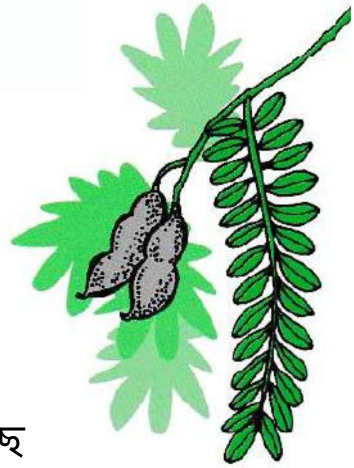
Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

60 আমরা কারা?



গাছ একটি
কিন্তু তার স্তম্ভ অনেক



আমি একটি ছোট কাঁটাযুক্ত গাছ
চকচকে হলুদ গোল ফলে আবৃত
আমার পাতাগুলো উজ্জ্বল সবুজ ও সুগন্ধি
আমার ফলগুলো টক রসে পূর্ণ
যা তোমরা জল, চিনি ও লবণ মিশিয়ে পান করো

একটি লম্বা গাছ, যার পাতাগুলো চওড়া ও পাখার মতো
যার ফল নরম, শাঁসালো, খেতে মিষ্টি
এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের
যার ভেতরে থাকে গোলমরিচের মতো কালো বীজ

তাদের পাতা আছে—কিন্তু কোনো ডালপালা নেই
ফুল আছে—কিন্তু কোনো সুগন্ধ নেই
ফল আছে—কিন্তু রোপণের জন্য কোনো বীজ নেই
শক্ত কাণ্ড আছে—কিন্তু নির্মাণের উপযোগী কাঠ নেই
তবে তাদের বংশধর বা চারাগাছ আছে প্রচুর!

মুক্তোর মতো সাদা ফুলগুলো গুচ্ছ হয়ে ফোটে
লম্বা ও সরু সবুজ সবজিগুলো ঝুলে থাকে
কোমল সবুজ পাতাগুলো রান্নায় ব্যবহৃত হয়
কিন্তু এই গাছে খাওয়ার উপযোগী কোনো পাকা ফল নেই!

মাঝারি থেকে ছোট আকারের একটি গাছ
যার ফলগুলো ফ্যাকাশে সবুজ ও টক,
ফলের গায়ে খাঁজ কাটা এবং তা খণ্ড বা কোয়ায় বিভক্ত,
এগুলো ভিটামিন 'সি'-এর ভাণ্ডার



আমি বেশ লম্বা, আর আমার বিশাল পাতাগুলো একসময় লাল হয়ে যায়
আমার বীজটি দেখতে চোখের আকৃতির মতো
এর বাইরের শক্ত খোসাটি ভাঙা বেশ কঠিন
তবে এটি খেলে সুস্বাস্থ্য লাভ হয়

আগুনের মতন টকটকে লাল রঙের ফুল
সরু ডালগুলো শত শত কাঁটায় আবৃত
ক্যাপসুলের মতো দেখতে ফলগুলো একসময় ফেটে যায়
আর ভেতর থেকে ছোট ছোট প্যারাশুটের মতো বীজগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়
যা গাছের চারপাশে বিছিয়ে তৈরি করে তুষারের মতো সাদা এক গালিচা



এর হৃদয় আকৃতির পাতাগুলোর নিচে
রয়েছে এক শীতল ও স্নিগ্ধ ছায়া

আমি শহর ও গ্রাম—উভয় স্থানেই বেড়ে উঠি
আমি সবাইকে ছায়া দান করি
আমার ফুলগুলো লাল রঙের
আমি দেখতে অত্যন্ত মনোরম ও রূপসী!



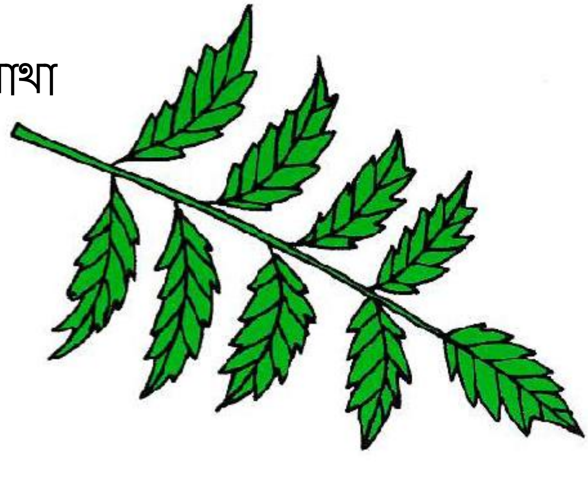
এর বিশাল, পাখার মতো পাতাগুলো মর্মরধ্বনি তোলে—
কী কোলাহল ই না তারা সৃষ্টি করে!
এর কাণ্ডটি সোজা এবং শাখাবিহীন!
কালো, আঁশযুক্ত ফলটি কেটে ফেলো—
আর এর বড়, মিষ্টি ও রসালো বীজগুলোর স্বাদ নাও।

কাঁচা ফলগুলো হয় সবুজ রঙের;
পাকা ফলগুলো হয় প্রবালের মতন লাল।
ফলটি উপভোগ করো, আর শক্ত বীজটি ফেলে দাও—
তবে এর কাঁটাযুক্ত ডালপালা থেকে সাবধান!

লম্বা গাছগুলি সূর্যের পানে মাথা তুলে দাঁড়ায়,
তাদের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
এর সরু, ধূসর পাতাগুলো পিষে গায়ে মেখে নাও—
দেখবে, তোমার মাথাব্যথা নিমিষেই উধাও হয়ে গেছে।

বালুকাময় উপকূলীয় অঞ্চলে আমাকে দেখতে পাবে।
আমার পাতাগুলো হয় পাতলা ও আঁশযুক্ত।
আমার ডালপালাগুলো দেখতে অনেকটা ঘোড়ার লেজের মতো।
আমার ফলগুলো হয় কাঁটাযুক্ত গোলকের মতো—
দেখতে ভারী সুন্দর—কিন্তু কেউ তা খায় না!

সোজা ও বলিষ্ঠ হয়ে এটি আকাশের পানে মাথা
তুলে দাঁড়ায়।
ভূগর্ভের গভীর জল—
তাই হল এর পানীয়।
আমাদের জন্য এটি জল বহন করে আনে—
মাথার ওপর কলসিতে ভরে।



এর টক-মিষ্টি ফল আমাদের রান্নায় স্বাদ যোগায়।
নির্মলভাবে তারা আমাদের পথের ওপর তাদের বিশাল ছায়া বিছিয়ে দেয়।
তারা মনোরম কুঞ্জবনেও দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে—
তাদের বাদামী রঙের শুঁটিগুলো লোভনীয়ভাবে ঝুলে থাকে।

আমার গভীর শিকড় আমাকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখে।
আমার গাঢ় ও শক্ত পাতাগুলো আমাকে শীতল রাখে।
আমার ভারী বোঝা আমি বহন করি মোটা ডালের ওপর—
যা কাটলে আঠালো দুধের মতো রস বেরিয়ে আসে।
আমার ফল হাজার হাজার মানুষের আহার যোগায়।

এর কচি পাতাগুলো দেখতে বড়ই কোমল।
এরপরই ফোটে ছোট ছোট সাদা ফুলের থোকা।
তারপর আসে কাঁচা সবুজ ফল—লবণ দিয়ে খেলে যা ভারি সুস্বাদু লাগে।
সবশেষে আসে অতুলনীয় পাকা ফলগুলো—
এরাই তো ফলের রাজা!



এ গাছের ছাল হল তেঁতো ।
এর পাতাও তেঁতো
এর সমগ্র সত্তাই তেঁতো!
এটি জীবাণু ও রোগবালাই দূরে সরিয়ে রাখে।

তালগাছ, আমগাছ, কাঠবাদাম গাছ, আমলকী গাছ, নিমগাছ, শিমুল গাছ, ঝাউগাছ, কলাগাছ, নারিকেল গাছ, কুলগাছ, তেঁতুল গাছ, গুলমোহর গাছ, পেঁপে গাছ, অশ্বত্থ গাছ, কাঁঠাল গাছ, ইউক্যালিপটাস গাছ, বটগাছ, সজনে গাছ, লেবু গাছ।

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

Bengali Sriparna Tamhane

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Artist Uma Krishnaswamy